টমাস আলভা এডিসন
[১৮৪৭-১৯৩১]

প্রচলিত অর্থে বিজ্ঞানী বলতে যা বোঝায় টমাস আলভা এডিসন সেই ধরনের বিজ্ঞানী নন। তিনি ছিলেন যন্ত্রবিদ, আধুনিক যন্ত্র সভ্যতায় প্রতিদিন আমরা যে সুফল অনুভব করছি, প্রকৃতপক্ষে তিনিই তার পথিকৃৎ।

তাঁর আবিষ্কৃত প্রতিটি যন্ত্রটি আজ মানবজীবনের সাথে একাত্ম হয়ে আছে। তাদের বাদ দিয়ে আমরা আমাদের জীবনের অস্তিত্ব কল্পনাও করতে পারি না।

যখনই আমরা কোন ইলেকট্রিক লাইট জ্বালি, টেলিফোন তুলে অন্যের সাথে কথা বলি, অথবা গ্রামাফোনে রেকর্ড বসিয়ে সুরের মূর্ছনায় মুগ্ধ হই, কিম্বা সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখি, তখন কল্পনাও করতে পারি না এ সমস্তই একজন মানুষের সৃষ্টি। গত শতাব্দীতে যে যান্ত্রিক সভ্যতার সূচনা হয়েছিল, এডিসনকে বলা যেতে পারে সেই সভ্যতার জনক।

এডিসনের জন্ম ১৮৪৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি কানাডার মিলানে। তাঁর পিতা ছিলেন ওলন্দাজ বংশোদ্ভূত। কয়েক পুরুষ আগে এডিসন পরিবার হল্যান্ড ত্যাগ করে আমেরিকায় এসে আশ্রয় নেন। কিছুদিন পর তাঁরা আমেরিকা ত্যাগ করে কানাডায় এসে বসবাস শুরু করেন।

এডিসনের পিতার আর্থিক সচ্ছলতার জন্য ছেলেবেলার দিনগুলি আনন্দেই কেটেছিল। সাত বছর বয়েসে এডিসনের পিতা মিচিগানের অন্তর্গত পোর্ট হারান নামে একটা শহরে নতুন করে বসবাস শুরু করলেন।

এখানে এসেই স্কুলে ভর্তি হলেন এডিসন। ছেলেবেলা থেকেই অসম্ভব মেধাবী ছিলেন তিনি। কিন্তু স্কুলের বাঁধা পাঠ্যসূচী তাঁর কাছে খুব ক্লান্তিকর মনে হত। তাই ক্লাসে ছিলেন সকলের পেছনের ছাত্র। ক্লাসে ছিলেন সকলের পেছনের ছাত্র। ক্লাসে বসে খোলা জানলা দিয়ে বাইরের মুক্ত প্রকৃতির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে প্রায়ই আনমনা হয়ে যেতেন। শিক্ষকরা অভিযোগ করতেন, এ ছেলের পড়াশুনায় কোন মন নেই। শিক্ষকদের কথা শুনে মনে মনে ক্ষুব্ধ হতেন এডিসনের মা। ছোট ছেলের প্রতি তাঁর বরাবরই দুর্বলতা ছিল। তাঁর মনে হত এই ছেলে একদিন বিখ্যাত হবেই। স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনলেন এডিসনকে। শেষ হল এডিসনের তিন মাসের স্কুল জীবন। এর পরবর্তীকালে আর কোনদিন স্কুলে যাননি। এডিসন মায়ের কাছেই শুরু হল তাঁর পড়াশুনা।

ছেলেবেলা থেকেই এডিসনের ঝোঁক ছিল পারিপার্শ্বিক যা কিছু আছে, যা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হয়, তা নিয়ে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বার করতে পারেন কিনা দেখবার জন্য ঘরের এক কোণে ডিম সাজিয়ে বসে পড়লেন। কয়েক বছর পর কিশোর এডিসন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার জন্য একটা ছোট ল্যাবরেটরি তৈরি করে ফেললেন তাঁর বাড়ির নিজের তলার একটা ঘরে।

ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি বলতে ছিল কিছু ভাঙা বাক্স, কিছু শিশি বোতল, ফেলে দেওয়া কিছু লোহার তার, আর এখান-ওখান থেকে কুড়িয়ে আনা যন্ত্রপাতির টুকরো। অল্প কিছুদিন যেতেই তিনি বুঝতে পারলেন হাতে-কলমে পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন যন্ত্রপাতি আর নানান জিনিসপত্রের। বাবার আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অর্থ ছাড়া তো কোন পরীক্ষার কাজই চালানো সম্ভব নয়। এডিসন স্থির করলেন তিনি কাজ করে অর্থ সংগ্রহ করবেন। তেরো বছরের ছেলে চাকরি করবে! বাবা-মা দুজনেই তো অবাক। কিন্তু এডিসন জেদ ধরে রইলেন, একগুঁয়ে ছেলে একবার যা স্থির করবে কোনভাবেই তার নড়চড় হবে না। অগত্যা মত দিতে হল এডিসনের বাবা-মাকে।

কিন্তু তেরো বছরের ছেলেকে কাজ দেবে কে? অনেক খোঁজাখুঁজির পর খবরের কাগজ ফেরি করার কাজ পাওয়া গেল। ট্রেনে পোর্ট হুরোন স্টেশন থেকে ডেট্রয়েট স্টেশনের মধ্যে যাত্রীদের কাছে খবরের কাগজ বিক্রি করতে হবে। বিক্রির উপর কমিশন। আরো কিছু বেশি আয় করবার জন্য এডিসন খবরের কাগজের সাথে চকলেট বাদামও রেখে দিতেন। কয়েক মাসের মধ্যেই বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করে ফেললেন।

এই সময় এডিসন সংবাদ পেলেন একটি ছোট ছাপাখানা কম দামে বিক্রি হচ্ছে। সামান্য যে অর্থ জমিয়েছিলেন তাই দিয়ে ছাপাখানার যন্ত্রপাতি কিনে ফেললেন, এবার নিজেই একটি পত্রিকা বার করে ফেললেন। সংবাদ জোগাড় করা, সম্পাদনা করা, ছাপানো, বিক্রি করা, সমস্ত কাজ তিনি একাই করতেন। অল্পদিনেই তাঁর কাগজের বিক্রির সংখ্যা বেড়ে গেল। এক বছরের মধ্যে তাঁর লাভ হল একশো ডলার। তখন তাঁর বয়েস পনেরো বছর।

স্টেশনে স্টেশনে ঘোরাঘুরি করতে করতে অনেক রেল কর্মচারীর সাথে আলাপ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত বিষয়েই ছিল তাঁর অদম্য কৌতূহল। একদিন এডিসন মাউন্ট ক্লিমেন্স স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল একটি ছেলে লাইনের উপর খেলা করছে। দূরে একটি ওয়াগন এগিয়ে আসছে। ছেলেটির সেদিকে নজর নেই। আসন্ন বিপদ বুঝতে পেরে হাতের কাগজ ফেলে দিয়ে এডিসন ঝাঁপিয়ে পড়লেন লাইনের উপর। ছেলেটিকে তুলে নিয়ে লাইন থেকে নিচে নেমে এলেন। ছেলেটি স্টেশনমাস্টারের একমাত্র পুত্র। কৃতজ্ঞ স্টেশনমাস্টার যখন এডিসনকে পুরস্কার দিতে চাইলেন, এডিসন টেলিগ্রাফি শেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সানন্দে রাজী হলেন স্টেশনমাস্টার। কয়েক মাসের মধ্যেই নিজের অসাধারণ মেধায় মোটামুটিভাবে টেলিগ্রাফি শিখে নিলেন, সেই সঙ্গে সাংকেতিক লিপি ও তার অর্থ বুঝে নিতে সক্ষম হলেন।

স্টেশন আর রেলগাড়ি হয়ে উঠল এডিসনের ঘর-সংসার। এখানেই তাঁর দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় কাটত। নিজের ইচ্ছাকে পুরোপুরি কাজে লাগাবার জন্য ট্রেনের মাল রাখবার একটি ছোট ল্যাবরেটরি গড়ে তুললেন। কাগজ বিক্রির ফাঁকে যতটুকু সময় পেতেন এখানে গবেষণার কাজ করতেন। একদিন চলন্ত ট্রেনে তাঁর হাত থেকে একটুকরো আগুন ছিটকে পড়ল কম্পার্টমেন্টের মেঝেতে। সাথে সাথে আগুন জ্বলে উঠল। বহু কষ্টে আগুন নেভানো হল। কিন্তু কন্ডাকটার রাগে ফেটে পড়ল। পরের স্টেশনে আসতেই ল্যাবরেটরির সব জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এডিসনের কানের উপর এক ঘুষি মেরে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিলেন। সেই আঘাতের ফলেই সমস্ত জীবন কানে কম শুনতেন এডিসন। এইবার শুরু হল তাঁর নতুন এক জীবন। স্টাফোর্ড জংশনে রাত্রিবেলায় ট্রেন ছাড়বার সিগনাল দেওয়ার কাজ পেলেন। রাত জেগে কাজ করতে হত আর দিনের বেলায় সামান্য কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়ে নিজে তৈরি করলেন যেটি আপনা থেকেই নির্দিষ্ট সময়ে সিগনাল দিত। এক জায়গায় বেশিদিন কাজ করবার অভ্যাস ছিল না এডিসনের। বোস্টন শহরে টেলিগ্রাফ অফিসে অপারেটারের কাজ নিলেন। কিন্তু প্রচলিত কলাকৌশলে কখনো সন্তুষ্ট হতেন না এডিসন। প্রতিমুহূর্তে তিনি চিন্তা করতেন নতুন কোন কৌশল উদ্ভাবন করতে যা আরো বেশি উন্নত আর সহজ।

এডিসন যেখানে চাকরি করতেন সেই অফিস জুড়ে ইঁদুরের ভীষণ উৎপাত। মাঝ মাঝেই তারা যন্ত্রপাতির মধ্যে ঢুকে পড়ে কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটাত। এডিসন একটি যন্ত্র বার করলেন

যাতে সহজেই ইঁদুরদের ধ্বংস করা যায়। এছাড়াও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আরো কিছু যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করলেন। কিন্তু তাতে কারোই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেন না।

১৮৬৯ সালে যখন তিনি বোস্টনে চাকরি করছেন তখন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন যা দিয়ে ভোল্ট গণনা করা যায়। এই যন্ত্রের পেটেন্ট পাবার জন্য তিনি আবেদন করলেন। এই যন্ত্রের গুণাগুণ বিবেচনা করে উদ্ভাবক হিসাবে তাঁকে পেটেন্ট দেওয়া হল। এই পেটেন্ট এডিসনের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। তিনি স্থির করলেন যা কিছু প্রত্যক্ষভাবে মানুষের ব্যবহার্য হিসাবে গণ্য হয়, শুধুমাত্র তেমন জিনিসই তৈরি করবেন। সমস্ত জীবনই তিনি এই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেছেন বোস্টন শহর আর ভাল লাগছিল না। সেখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি চলে এলেন নিউ ইয়র্কে। হাতে একটি পয়সা নেই, দুদিন প্রায় কিছু খাওয়া হয়নি। কোথায় যাবেন, কি করবেন কিছুই জানেন না। এমন সময় আলাপ হল এক অল্পবয়সী টেলিগ্রাফ অপরেটারের সাথে। সে এডিসনকে এক ডলার ধার দিয়ে গোল্ড ইনডিকেটর (Gold indicator Company) কোম্পানির ব্যাটারি ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। দু দিন সেখানে কেটে গেল। তৃতীয় দিন এডিসনের নজর পড়ল অফিসের ট্রানসমিটারটি খারাপ হয়ে গিয়েছে। অফিসের ম্যানেজার, কর্মচারীরা বহু চেষ্টা করেও যন্ত্রটি ঠিক করতে পারছে না। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করতেই যন্ত্রটির খারাপ হওয়ার কারণ বুঝতে অসুবিধা হল না এডিসিনের। ম্যানেজারের অনুমতি নিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে ট্রানসমিটারটি ঠিক করে দিলেন। ম্যানেজার খুশি হয়ে তখনই তাঁকে কারখানার ফোরম্যান হিসাবে চাকরি দিলেন। তাঁর মাইনে ঠিক হল ৩০০ ডলার। কিছুদিনের মধ্যেই নিজের যোগ্যতায় ম্যানেজার পদে উন্নীত হলেন।

ম্যানেজার হিসাবে যে অর্থ পেতেন এডিসন তা দিয়ে নিজের প্রয়োজনীয় নানান যন্ত্রপাতি কিনে গবেষণার কাজ করতেন। গোল্ড ইন্ডিকেটর কোম্পানি টেলিগ্রাফের জন্য এক ধরনের যন্ত্র তৈরি করত যার ফিতের উপর সংবাদ লেখা হত। এডিসনের মনে হত বর্তমান ব্যবস্থার চেয়ে আরো উন্নত ধরনের যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার। চাকরিতে ইস্তফা দিলেন এডিসন। কয়েক মাস নিরলস পরিশ্রমের পর উদ্ভাবন করলেন এক নতুন যন্ত্র যা আগের চেয়ে অনেক উন্নত আর উৎপাদন ব্যয়ও কম। এডিসন যন্ত্রটি নিয়ে গেলেন গোল্ড ইন্ডিকেটর কোম্পানির মালিকের কাছে। যন্ত্রটি পরীক্ষা করে খুশি হলেন কোম্পানির মালিক। এডিসনকে জিজ্ঞাসা করলেন, কত দামে সে যন্ত্রটি বিক্রি করতে চায়? এডিসন দ্বিধাগ্রস্তভাবে বললেন, যদি পাঁচ হাজার ডলার দাম বেশি বলে মনে হয় আবার তিন হাজার খুব কম হয় তবে কোম্পানি স্থির করুক তারা কি দামে যন্ত্রটি কিনবে।

কোম্পানির মালিক এডিসনকে চল্লিশ হাজার ডলার দিয়ে বললেন, আশা করি আমরা আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছি।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন এডিসন।

এই অর্থ এডিসনের জীবনে এক পরিবর্তন নিয়ে এল। এতদিন তিনি অন্যের অধীনস্ত হয়ে কাজ করতেন। সেখানে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবার জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ ছিল না।

এডিসন স্থির করলেন তিনি একটি কারখানা স্থাপন করবেন। কয়েক মাসের চেষ্টায় নিউজার্সিতে তৈরি হয় কারখানা। মনোমত কিছু পরিশ্রমী বুদ্ধিমান কর্মচারী পেতে বিলম্ব হল না। এডিসন হলেন তাদের মধ্যমণি। দিবারাত্র সেখানে কাজ চলত। রাত্রে মাত্র কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম নিতেন এডিসন, বাকি সমস্ত সময় কর্মচারীদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে চলতেন।

অনেকে জিজ্ঞাসা করত এই কারখানায় কি উৎপাদন হয়? এডিসন জবাব দিতেন অন্যের কারখানায় যা উৎপাদন হয় এখানেই তাই তৈরি হয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কারখানাটি ছিল একটি গবেষণাগার। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি প্রায় একশোটির বেশি নতুন জিনিস উদ্ভাবন করে তার পেটেন্ট নিলেন। এই সমস্ত পেটেন্ট বিক্রি করে হাতে অর্থও আসতে আরম্ভ করল।

ইতিমধ্যে বিবাহ করেছেন এডিসন। তাঁর স্ত্রীর নাম মেরি স্টীলওয়েল। মেরি এডিসনের কারখানায় তাঁর সহকর্মী হিসাবে কাজ করতেন। মেরি ছিলেন যেমন দক্ষ তেমনি বুদ্ধিমতী। একদিন ঘরের মধ্যে কাজ করছিলেন এডিসন আর মেরি, সামনে বিশাল কাঠের টেবিলে, দুজনে টেবিলের দুপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ এডিসন মেরির দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে একটি মুদ্রা বার করলেন তারপর টেলিগ্রাফ পাঠাবার জন্য যে সাংকেতিক ধ্বনি ব্যবহার করা হয় (Morse Code), টেবিলে মুদ্রা দিয়ে আঘাত করে সেই সাংকেতিক ধ্বনিতে বললেন,

–মেরি।

মেরিও সাংকেতিক লিপি জানতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করছেন?

এডিসন টেবিলের উপর মুদ্রার ধ্বনি তুলে বললেন,

–তুমি কি আমাকে বিবাহ করতে চাও?

মেরির মুখ লজ্জায় আভায় রাঙা হয়ে উঠল, কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সাংকেতিক বার্তায় বললেন,

–আপনাকে পেলে আমি সুখী হব।

অল্প কয়েকদিন পরেই দুজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। মেরি শুধু এডিসনের স্ত্রী ছিলেন না, ছিলেন তাঁর যোগ্য সহধর্মিনী। এডিসনের সাফল্যের পেছনে তাঁর ভূমিকাও কম নয়। ১৮৮৪ সালে মেরির মৃত্যু হয়। তখন তিনি তিন সন্তানের জননী। মেরির মৃত্যুর দুবছর পর এডিসন মিনা মিলারকে বিবাহ করেন, কিন্তু জীবনের এই পর্বে তাঁর সৃজনীশক্তি আশ্চর্যজনকভাবে হ্রাস পেয়েছিল।

নিজের কারখানায় কাজ করতে করতে, পুনরায় আকৃষ্ট হলেন টেলিগ্রাফির দিকে। অল্পদিনেই তৈরি হল ডুপ্লেক্স টেলিগ্রাফ পদ্ধতি। এর সাহায্যে দুটি বার্তা একই সাথে একই তারের মধ্যে দিয়ে দুই দিকে পাঠানো সম্ভব। এর পরে একই সময়ে একই তারের মধ্যে দিয়ে একাধিক বার্তা প্রেরণ করতে সক্ষম হলেন।

এই পদ্ধতির সাহায্যে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার শুধু যে অসাধারণ উন্নতি করতে সক্ষম হলেন তাই নয়, খরচও কয়েকগুণ হ্রাস পেল।

১৮৭৬ সালে এডিসন তাঁর নতুন কারখানা স্থাপন করলেন মেনলো পার্কে। এখানে একদিকে তাঁর গবেষণাগার অন্যদিকে কারখানা। এই মেনলো পার্কেই এডিসনের প্রথম উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার, টেলিফোন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ। টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন গ্রাহাম বেল কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার একাধিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এডিসনকে অনুরোধ করা হল টেলিফোন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করবার জন্য।

এডিসন কয়েক মাসের চেষ্টায় তৈরি করলেন কার্বন ট্রান্সমিটার। এতে গ্রাহকদের প্রতিটি কথা স্পষ্ট আর পরিষ্কারভাবে শোনা গেল। এডিসনের খ্যাতি সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

টেলিফোন যন্ত্র নিয়ে যখন এডিসন কাজ করতেন তখন প্রায়ই তাঁর মনে হত যদি এমন কোন যন্ত্র উদ্ভাবন করা যায় যার দ্বারা মানুষের কথাকে যন্ত্রের মধ্যে ধরে রাখা সম্ভব তাহলে এক যুগান্তর সৃষ্টি হবে। টেলিফোনের কাজ শেষে করে তিনি এই বিষয় নিয়ে শুরু করলেন।

১৮৭৭ সালে বছর শেষ হয়ে এসেছে। একদিন এডিসন তাঁর এক কর্মচারীকে একটি স্কেচ দেখে মডেল তৈরি করতে বললেন, কর্মচারীটি বহুক্ষণ চেষ্টা করেও মডেলটি তৈরি করতে পারল না। এডিসন কারখানার ফোরম্যানের উপর দায়িত্ব দিলেন। ফোরম্যান কিছুক্ষণ স্কেচটি নাড়াচাড়া করে বলল, এ মডেল তৈরি করা অসম্ভব। এইবার নিজেই কাজে হাত দিলেন এডিসন। তিনি মেশিনটি তৈরি করে তার গায়ে ফয়েলের একটি মোড়ক জড়িয়ে দিলেন, তারপর হ্যান্ডেলটা ধরে নাড়াতে নাড়াতে একটা নলের সামনে মুখ রেখে একটা ছড়া বললেন, "মেরির একটা ভেড়া আছে..."

তারপর আবার যন্ত্রটার হাতল ঘোরাতেই এডিসনের কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল যন্ত্রের মধ্যে। যদিও অস্পষ্ট কিন্তু মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠলেন এডিসন। কয়েকদিন চেষ্টায় যন্ত্রটির নতুন রূপ দিলেন এডিসন। তারপর তাতে ধরা পড়ল এডিসন। তারপর তাতে ধরা পড়ল এডিসনের কথা, মেরির কবিতা। সৃষ্টি হল ফোনোগ্রাফ যা আধুনিক কালের গ্রামোফোন রেকর্ড। তখন এডিসনের বয়স মাত্র ত্রিশ বছর।

সমস্ত মানুষ বিস্ময়ে হতবাক। চতুর্দিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল, "মেনলো পার্কের জাদুকর"। শুধু মানুষের মুখে নয়, বিভিন্ন পত্রিকাতেও এই নামে তাঁকে ডাকা হত।

একবার এক পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছিল, এক মহান বিজ্ঞানী।

এডিসন প্রবন্ধটি পড়ে বললেন, আমি বিজ্ঞানী নই, আমি একজন উদ্ভাবক। বিজ্ঞানী হচ্ছেন মাইকেল ফ্যারাডে। তিনি অর্থের জন্য কাজ করেন না। কিন্তু আমি করি। প্রতিটি কাজকেই বিচার করি তার অর্থমূল্য দিয়ে। যে কাজে উপযুক্ত অর্থ পাবার সম্ভাবনা নেই সেই কাজে আমি আগ্রহ প্রকাশ করি না।

প্রকৃতপক্ষে অর্থ নিয়ে নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্র বিক্রি করলেও যখন তিনি নিজের গবেষণাগারে কিম্বা কারখানায় কাজ করতেন, তখন তিনি বিজ্ঞানীর মতই নিজের সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর সাধনার বিষয় ছিল যেমন বহু বিচিত্র তেমনি ব্যাপার।

একবার হেনরি ফোর্ড ও টমাস আলভা এডিসন একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছেন। সেখানে বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য খাতা ছিল। তাতে প্রত্যেকের জন্য তিনটি লাইন লেখা ছিল। প্রথম বাড়ির ঠিকানা, দ্বিতীয় পেশা, তৃতীয় কোন বিষয়ে আগ্রহ আছে? এডিসন প্রথম দুটি লাইন শেষ করে তৃতীয় লাইনে লিখলেন, 'সর্ববিষয়ে'।

এতদিন মানুষের শ্রবণযন্ত্র নিয়ে ছিল তাঁর কাজকারবার, এইবার মনে হল ইলেকট্রিক বকারেন্টকে কাজে লাগিয়ে আলো জ্বালাবেন, তখন অবশ্য এক ধরনের বৈদ্যুতিক আলো ছিল কিন্তু তা ব্যবহারের উপযোগী ছিল না। এডিসনের মনে হল ইলেকট্রিক কারেন্টকে বিভক্ত করা প্রয়োজন কারণ তা না হলে একই লাইনে একাধিক আলো জ্বালানো সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা এডিসনের অভিমতকে অসম্ভব বলে বাতিল করে দিল।

কোন কিছুতেই পিছিয়ে পড়ার মানুষ ছিলেন না এডিসন। তিনি তাঁর দক্ষ পঞ্চাশ জন কর্মচারী নিয়ে কাজ শুরু করলেন। প্রথমেই তিনি এমন একটি ধাতুর সন্ধান করছিলেন যার মধ্যে কারেন্ট প্রবাহিত করলে উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করে। তিনি বিভিন্ন রকমের ধাতু নিয়ে ১৬০০ রকমের পরীক্ষা করলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "আমি ইলেকট্রিক লাইট সম্বন্ধে যে তিন হাজার তত্ত্ব খাড়া করেছি তাদের অধিকাংশই সঠিক, কিন্তু মাত্র দুটি ক্ষেত্রেই আমি সম্পূর্ণ নির্ভুল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল কার্বন ফিলামেন্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে, আর এই ফিলামেন্টের মধ্যে দিয়েই আলো বিকিরণ করবে।"

দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর তৈরি হল কার্বন ফিলামেন্ট। এডিসন নিজেই লিখেছেন সেই চমকপ্রদ কাহিনী। "ফিলামেন্ট তৈরি হওয়ার পর তাকে কাচ তৈরির কারখানায় নিয়ে যেতে হবে। ব্যাচিলরের (এডিসনের এক সহকর্মী) হাতে কার্বনের ফিলামেন্ট। পেছনে আমি। এমনভাবে দুজনে চলেছি মনে হচ্ছে যেন কোন মহামূল্যবান সম্পত্তি নিয়ে যাচ্ছি। কাচের কারখানায় সবেমাত্র পা দিয়েছি, সম্ভবত অতি সতর্কতার জন্যেই হাত থেকে ফিলামেন্টটি মাটিতে পড়ে দু-টুকরা হয়ে গেল।

হতাশ মনে ল্যাবরেটরিতে ফিরে গেলাম। নতুন ফিলামেন্ট তৈরি করে আবার চললাম কাচ কারখানায়। কপাল মন্দ, এইবার এক স্বর্ণকারের হাতের স্ক্রু ড্রাইভার পড়ে ভেঙে টুকরো হয়ে গেল। আবার ফিরে গেলাম। রাত হবার আগেই নতুন একটা কার্বন নিয়ে এসে বাল্বের মধ্যে ঢোকালাম। বাল্বের মুখ বন্ধ করা হল, তারপর কারেন্ট দেওয়া হল। মুহূর্তে চোখের সামনে জ্বলে উঠল বৈদ্যুতিক বাতি।"

প্রথম বৈদ্যুতিক বাতিটি প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা জ্বলেছিল। দিনটা ছিল ২১শে অক্টোবর ১৮৭৯ সাল, এডিসন সেদিন কল্পনাও করতে পারেননি তাঁর সৃষ্ট আলো একদিন পৃথিবীর সমস্ত গৃহের অন্ধকার দূর করবে।

প্রথমে তিনি শুধুমাত্র বাল্বের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। এরপর প্রয়োজন দেখা দিল সমগ্র বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির সাধন করা। এডিসন নতুন এক ধরনের ডাইনামো তৈরি করলেন, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার জেনারেটর থেকে শুরু করে ল্যাম্প তৈরি করা, পর্যন্ত তাকে জ্বালানোর উপায় বার করা সমস্তই তাঁর উদ্ভাবন। যখন নিউইয়র্কে প্রথম বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র গড়ে উঠল, এডিসন ছিলেন একাধারে তার সুপারিনটেন্ডন্ট, তার ফোরম্যান, এমনকি তার মজদুর। এত কাজের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েও কখনো বিব্রত বোধ করতেন না। আসলে দিন-রাতের প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি কাজে লাগাতে চাইতেন। অকারণ বিশ্রাম, হাসি আমোদ সময় কাটাতে চাইতেন না।

একদিন একটি নিমন্ত্রিত বাড়িতে গিয়েছেন তিনি। গৃহকর্তা বিশেষ কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। লোকজনের ভিড়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এডিসন। আর অপেক্ষা না করে ফিরে যাবার জন্য বাইরের দরজার সামনে আসতেই গৃহকর্তার সাথে সাক্ষাৎ হল। এডিসনকে দেখামাত্রই তিনি বললেন, "আপনি এসেছেন দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। এখন আপনি কি নিয়ে কাজ করছেন?"

এডিসন সাথে সাথে বললেন, "কি করে আমি বার হতে পারি তাই নিয়ে।"

১৮৪৭ সালে এডিসন তাঁর বিখ্যাত মেনলো পার্ক ছেড়ে ওয়েস্ট অরেঞ্জে এলেন (West Orange)। এই সময় তিনি শব্দের গতির মত কিভাবে ছবির গতি আনা যায় তাই নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছিলেন। মাত্র দু'বছরের মধ্যে তিনি উদ্ভাবন করলেন 'কিনেটোগ্রাফ' যা গতিশীল ছবি তোলবার জন্য প্রথম ক্যামেরা। যখন আমেরিকাতে বাণিজ্যিভাবে ছায়াছবি নির্মাণের কাজ শুরু করার ভাবনা-চিন্তা চলছিল তখন সিনেমার প্রয়োজনীয় সব কিছুই উদ্ভাবন করে ফেলেছেন এডিসন। প্রথম অবস্থায় সিনেমা ছিল নির্বাক। ১৯২২ সালে এডিসন আবিষ্কার করলেন কিনেটোফোন যা সংযুক্ত করা হল সিনেমার ক্যামেরার সাথে। এরই ফলে তৈরি হল সবাক চিত্র।

অতি সাধারণ জিনিস থেকে সিনেমা ক্যামেরার মত জটিল যন্ত্রের উদ্ভাবনের কথা ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়, কি অসাধারণ ছিল তাঁর প্রতিভা।

এডিসন তাঁর ছুটির দিনগুলি কাটাবার জন্য সুন্দর একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন। একদিন তাঁর বন্ধুবান্ধব আত্মীয় পরিজনদের সেই বাড়িতে এসে উপস্থিত হলে তাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবকিছু দেখালেন। বাড়ির বিভিন্ন কাজের সুবিধার জন্য যে সব যন্ত্রপাতি উদ্ভাসিত করেছেন তাও দেখাতে ভুললেন না। সকলেই মুগ্ধ, শুধু একজন অতিথি বললেন, "আপনার বাড়ির সবকিছুই ভাল শুধু বাড়িতে ঢোকবার গেটটা ভীষণ শক্ত। জোরে চাপ দিয়ে খুলতে হয়।"

এডিসন হাসতে হাসতে বললেন, "তোমরা যখন চাপ দিয়ে দরজা খুলছ তখন আট গ্যালন জল পাম্প করে আমার বাড়ির ছাদে ট্যাঙ্কে ভর্তি হচ্ছে।"

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে পর্যন্ত তিনি নানান পরীক্ষ-নিরীক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। প্রতিভায় বিশ্বাস করতেন না এডিসন, বলতেন, পরিশ্রমই হচ্ছে প্রতিভার মূল কথা।

এই মহান কর্মবীর মানুষটির মৃত্যু হয় ১৯৩১ সালের ১৮ই অক্টোবর। তাঁর মৃত্যুর পর নিউইয়র্ক পত্রিকায় লেখা হয়, "মানুষের ইতিহাসে এডিসনের মাথার দাম সবচেয়ে বেশি। কারণ এমন সৃজনীশক্তি অন্য কোন মানুষের মধ্যে দেখা যায়নি।"